'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত
তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০২০ সালে প্রকাশিত ৮৬ পৃ.
তালিকার ৬০ পৃ. এবং ৮৪ পৃ. উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২তম বর্ষ, ১২৬ (ক) সংখ্যা, নভেম্বর, ২০২০

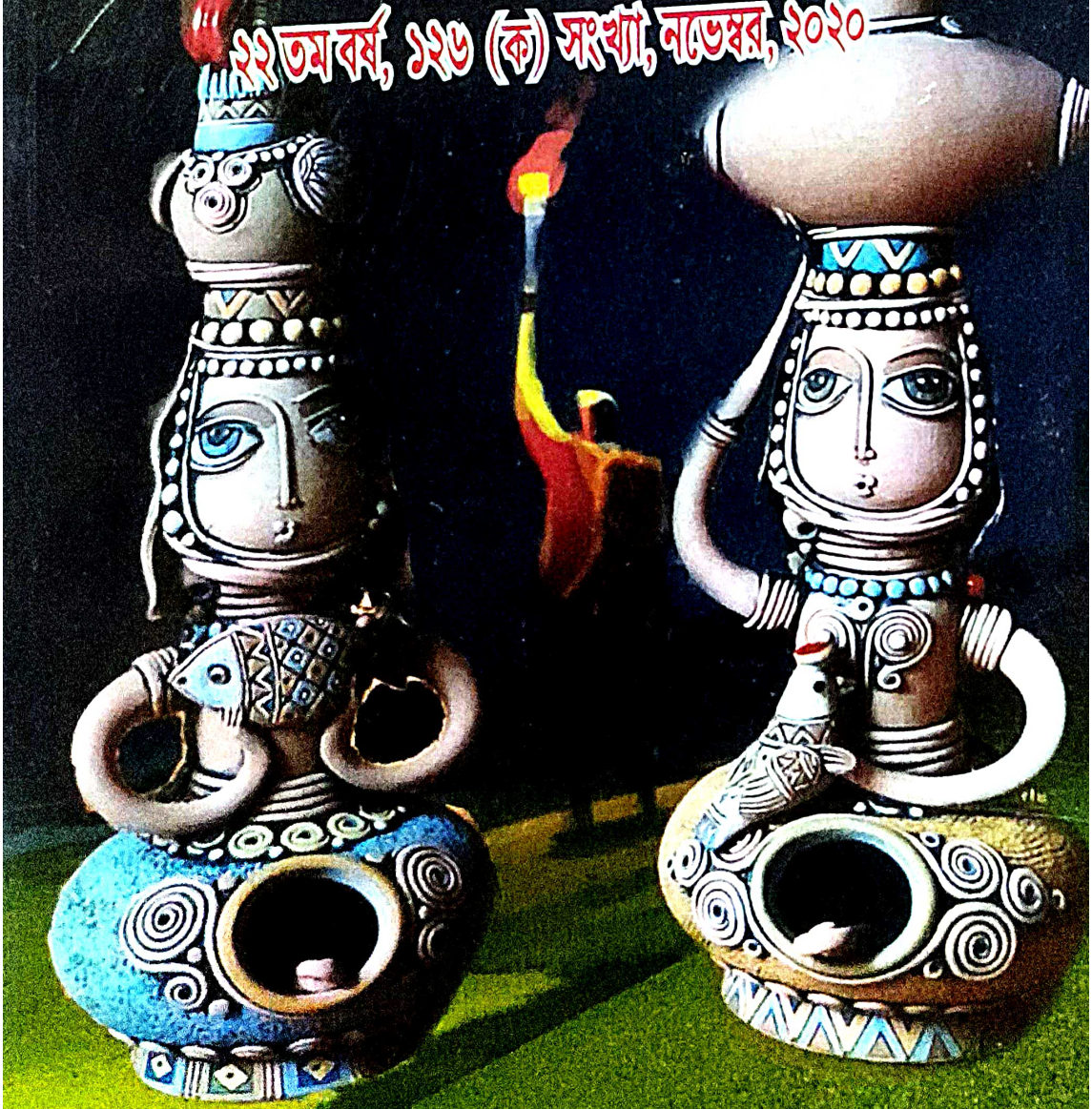

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
২০২০সালে প্রকাশিত ৮৬পৃ.তালিকার ৬০ পৃ.এবং ৮৪পৃ.উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১২৬(ক) সংখ্যা
নভেম্বর,২০২০

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা
সহসম্পাদক
পায়েল দাস বেরা
মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

৫৮ .মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর 'আত্মকথা অথবা সত্যের
প্রয়োগ': একটি পাঠ :: মানস কুণ্ডু.....৪৭১
৫৯ .বিজ্ঞাপন ও গণমাধ্যম রূপে আলকাপ লোকনাট্য
:: মো: সাহাবুদ্দিন আনসারী.....৪৭৯
৬০ .বাঙালি মুসলমান মানস গঠনে সংবাদপত্র ও
বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা :: মহ. মইনুল ইসলাম.....৪৮৮
৬১ .বাংলায় মারাঠা আক্রমণের এক খণ্ড প্রতিচ্ছবি : হেমেন্দ্রকুমার
রায়ের 'বর্গী এলো দেশে' :: মৃণাল কান্তি রায়.....৫০১
৬২ .অর্থনৈতিক অচলাবস্থার জ্বলন্ত প্রতিবিম্ব : শচীন্দ্রনাথ
সেনগুপ্তের 'মাটির মায়া' :: পাপিয়া সামন্ত.....৫১০
৬৩ .পাণিনিব্যাকরণে প্রত্যাহারগঠন : একটি
ভাষ্যসম্মত আলোচনা :: প্রসেনজিৎ মণ্ডল.....৫১৬
৬৪ .বৈচিত্র্যময় লোকজ উপাদান : রবীন্দ্রনাটক :: সালেহা খাতুন.....৫২২
৬৫ .হেমন্তবালা দেবীর 'নতুন রূপকথা' : একটি বিকল্প পাঠ
:: শ্রীময়ী ব্যানার্জী.....৫২৯
৬৬ .বিপ্লবী আন্দোলনে বোমার প্রচলন ও ব্যবহারে বাঙালী
:: সুজন দেবনাথ.....৫৩৯
৬৭ .বাস্তবতা বনাম অতি-আধুনিকতার তর্ক এবং শেষ
প্রশ্ন উপন্যাসের শিল্পরূপ :: তন্ময় সিংহ মহাপাত্র.....৫৪৭
৬৮ .মিথ, মানুষ ও প্রকৃতি: পরিবেশবাদী দৃষ্টিতে অমিতাভ
ঘোষের The Hungry Tide :: প্রদীপ কুমার বেরা.....৫৫৪
৬৯ .ছোটোগল্প নিয়ে কিছুপ্রশ্ন এবংতার পর্যালোচনা::সারমিন রহমান....৫৬২
৭০ .অথর্ববেদের যজ্ঞতত্ত্ব সম্পর্কীয় দুচার কথা :: উজ্জ্বল কর্মকার.....৫৬৮
৭১ .রাণী চন্দর লেখনীতে সার্ধশতবর্ষ অতিক্রান্ত বরেণ্য
শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ :: বীণাপাণি ঘোষ.....৫৭২
৭২ .সাঁওতালি ভাষার সংক্ষিপ্ত পরিচয় :: শ্যামচরণ হেমব্রম.....৫৮০
৭৩ .শিকড়চ্যুত বিচ্ছিন্নতাবোধ ও জহর সেনমজুমদার ::সুশোভন পাইন.....৫৮৫
৭৪ .বর্তমান সময়ে দেশাত্মবোধের প্রাসঙ্গিকতা -
একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যয়ন ::: পার্থ প্রতিম মিশ্র.....৫৯০
৭৫ .বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রতিবিম্বন : হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর '
বেনের মেয়ে' উপন্যাস :: রাজেস আলি.....৬০৩
০০লেখক পরিচিতি.....৬১৫
০০০UGC--CARE list.....৬১৯

শিকড়চ্যুত বিচ্ছিন্নতাবোধ ও জহর সেন মজুমদার

সুশোভন পাইন

একজন মানুষ সারাদিন ধরে যা কিছু খুঁজে বেড়ায় বা হাতড়ে বেড়ায় তার আশ্রয় হতে পারে জহর সেনমজুমদারের কবিতা। বর্তমান সময়ে নাগরিক জীবনের জটিল প্রক্ষেপ, ব্যাধিগ্রস্ত সংস্কৃতির মাঝে দাঁড়িয়ে ভূমি-ভৌগোলিক লোকায়ত বাস্তবতা, ভাষা ও ভাবনা জহর সেনমজুমদারের কবিতার দ্বীপ, কবিতার দীপ্তি। বৈজ্ঞানিক আধুনিকতার হাত ধরে আমাদের জীবনে যে নিষ্প্রাণ ও নির্লিপ্ত ভয়াবহ যান্ত্রিক আধিপত্যবাদ ক্রমশ ঘিরে ধরেছে, তাতে আমাদের ঘর ভরে উঠেছে বিজ্ঞান ও যন্ত্রসর্বস্ব উপাদান দিয়ে; কিন্তু মনের অভ্যন্তরপ্রদেশে সর্বদাই দলবৃত্ত ছন্দে একটা রক্তক্ষরণ ক্রমাগত হয়ে চলেছে। প্রতিমুহূর্তে জীবনের প্রতি অনাস্থায়, অবিরাম আত্মদশংনে, আত্মক্ষরণে মানুষ আজ ক্লান্ত, বিধবস্ত, সহায়সম্বলহীন দিগভ্রষ্ট, নিঃসঙ্গ ও অসহায়। আধুনিককালে জীবন-জীবিকার টানে আমরা যতই নগরাভিমুখী হয়েছি কিংবা নাগরিক চক্রব্যূহে নিজেরা জড়িয়ে পড়েছি ততই যেন আমরা হারিয়ে ফেলেছি আমাদের দেশ-কাল-মাটি ও প্রকৃতি-সংলগ্ন প্রবহমান শিকড়; নষ্ট হয়ে গেছে ভূমি-ভৌগোলিক লোকায়ত জীবনের সঙ্গে আমাদের চিরকালীন যোগসূত্র। বস্তুত নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার ঘোড়ায় চেপে কখনও স্বপ্নপূরণের তাগিদে আবার কখনও বা অর্থ, যশ, চাকরির প্রলোভনে মানুষ যত তার কাছাকাছি আসতে চেয়েছে এবং নাগরিক জীবনে আস্থা প্রদর্শন করেছে ততই প্রতিনিয়ত ক্ষরিত হয়েছে মানুষের অন্তরাত্মা; লোভ ও ভোগের পাহাড়ে উঠতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলাতে না পেরে বারবার মুখ থুবড়ে পড়েছে তার আদর্শ, স্বপ্ন কিংবা নিরাপদ আশ্রয়ের ঠিকানা। অন্যদিকে যে দেশ-কাল-মাটির সঙ্গে আমাদের চিরন্তন সম্পর্ক ছিল, ভালোবাসার নিবিড় আলিঙ্গন ও প্রত্যয় ছিল, কোমল পেলব প্রকৃতির সঙ্গে বিশ্বাসযোগ্য অন্তরঙ্গতা ছিল তাও ধীরে ধীরে ঘুন ধরা পোকা যেভাবে অবিরাম দংশনে বস্তুবিশ্ব নষ্ট করে দেয় সেভাবেই আমাদের দেশ-কাল-মাটির সঙ্গে চিরন্তন সম্পর্কটি নষ্ট হয়ে গেল। অথচ আশ্চর্যের বিষয় আমরা বহমান স্রোতে গা ভাসিয়ে একইরকম ভোগবিলাসেরমধ্যে ডুবে রইলাম; নাগরিক সভ্যতার কাছে আমাদের সমস্ত কিছু সমর্পণ করেও কাঙ্ক্ষিত দেশ ও

আশ্রয় খুঁজে পেলাম না, বরং আমাদের চারপাশে ধ্বংস ও পতন দেখতে দেখতে আজ আমাদের অস্তিত্বটাই সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছে। মূল্যবোধহীন সমাজ ব্যবস্থায় নাগরিক অবক্ষয় ও চূড়ান্ত অন্ধকারের মধ্যে ডুবে থাকতে থাকতে দেশ-মাটি শিকড়ের সঙ্গে আমাদের যে আবহমান সংযোগ ছিল তাও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে জহর সেনমজুমদারের কবিতা যথেষ্ট গুরুত্ব ও তাৎপর্যে পরিপূর্ণ। কেন-না তাঁর কবিতার মর্মমূলেও রয়েছে আধুনিক জীবনে এই দিশেহারা বিপন্ন মানুষের আত্মদংশনজাত মনের কথা, রক্তক্ষরণ ও হাহাকার ধ্বনি; আর সেই সঙ্গে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে একটি নিরাপদ নীড়, একটি নিরাপদ দেশ খুঁজে পাওয়ার অবিরাম নিরলস প্রয়াস বলা যেতে পারে সমগ্র জীবন জুড়ে খুঁজতে থাকা বা হাতড়ে বেড়ানো সেই নিরাপদ আশ্রয়ের ঠিকানা।

জহর সেন মুজমদার যখন বাংলা কবিতার জগতে প্রবেশ করেছেন; তখন মল্লিকা সেনগুপ্ত, রাহুল পুরকায়স্থ, সংযম পাল, বিজয় সিংহ, জয়দেব বসু, চৈতালি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরাও তাঁর পাশাপাশি কবিতা লিখতে এসেছিলেন; তবু কোথাও যেন মনে হয় জহর তার সমকালের কবিদের থেকে দৃষ্টিশক্তি ও পর্যবেক্ষণশক্তিতে অনেক বেশী স্বতন্ত্র। বিশেষ করে কবিতার ভাষা ও শব্দচয়নের ক্ষেত্রে তিনি তো একেবারেই স্বতন্ত্র। এছাড়া লোকায়ত ভাবনার মধ্য দিয়ে তিনি ক্রমাগত নিজের কবিতার জগৎ তৈরি করে নিয়েছেন। অন্যান্য অনেক কবির কবিতার ভিড়েও জহরের কবিতা যেন দূর নভোগুলের গভীর থেকে বিচ্ছুরিত এক নিঃসঙ্গ নক্ষত্রের দ্যুতি, ইঙ্গিতধর্মী, সংকেতধর্মী; যাকে পুরোপুরি ধরা যায় না, চর্যাপদের ভাষার মতোই কতক বোঝা যায়, কতক বোঝা যায় না। অর্থাৎ কবিতার জগতে নিজস্ব এক সৃজনবিশ্ব নির্মাণ করেছেন তিনি। এছাড়া টানা গদ্যের প্রয়োগ ও ব্যবহারে, ব্যঞ্জনা ও চিত্রকল্পের প্রয়োগে এবং সর্বোপরি বিষয়বৈচিত্র্যে কবি জহর সেনমজুমদারের সৃষ্টিসম্ভার অভিনব এক বিস্ময়কর সেতু নির্মাণ করেছে। প্রথম থেকে শেষ মূলত প্রতিটি কাব্যগ্রন্থে তিনি প্রায় আগুনের মতো বারবার মাটি ও শিকড়কে স্পর্শ করে নিজের অস্তিত্ব ও চৈতন্য গঠন করেছেন। যেমন একটি কবিতায় তিনি বলেছেন-

"বীজক্ষেত রুগ্ন হয় নাই
রুপসীরা ভুল বুঝিয়াছে।
এইখানে শঙ্খশিখা আছে
এইখানে গৌড়গঙ্গা আছে
সন্ধ্যা আসে চাঁদের নৌকায়
চেয়ে থাকে চুলখোলা মাঠ
চেয়ে থাকে মৃদু দুঃখবাদ
কাটা হাতে বাঁশি তুলে নিয়ে

শ্রীকৃষ্ণও পথে পথে ধায়
বীজক্ষেত রুগ্ন হয় নাই
দেখ দেখ শৃঙ্গারের শ্রী
দেখ দেখ শতাব্দীর শ্রী"

জহর সেনমজুমদারের সমকালীন কবিদের কবিতায় এই লোকায়ত জীবনের ছবি বা শিকড়ের কথা নেই একথা ঠিক নয়। বরং এভাবে আমরা বলতে পারি তাঁর পূর্বজ বা সমকালীন কবিরা বাংলা কবিতায় যে দেশ-মাটি-জল-আলো প্রকৃতি-সংলগ্ন শিকড় চেতনার কথা বলেছিলেন কিন্তু কখনোই সামগ্রিকতা দিয়ে যাননি— সেক্ষেত্রে জহর সেনমজুমদার তাঁর কবিতার মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বারবার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু করে তুলেছেন। এই সূত্রে বলা যায় বাংলা কবিতায় তাঁর মতো শিকড়ের অনুসন্ধান খুব কম কবিই করেছেন। তিরিশের দশকে জীবনানন্দ তাঁর 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭) কাব্যগ্রন্থে, চল্লিশের দশকে অরুণ মিত্র তাঁর 'ঘনিষ্ঠ তাপ' (১৯৬০) কাব্যগ্রন্থে, পঞ্চাশের দশকে কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' কাব্যগ্রন্থে, ষাটের দশকে দেবদাস আচার্য তাঁর 'মৃৎ শকট' কাব্যগ্রন্থে, সত্তরের দশকে কবি গৌতম বসু তাঁর 'অন্নপূর্ণা ও শুভকাল' কাব্যগ্রন্থে এইভাবে শিকড় সন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। এই সমস্ত কবিদের গুরুত্বের কথা মাথায় রেখেও একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় জহরের সঙ্গে তাঁদের একটা মৌল তফাত নিশ্চিতভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। এইসব কবিরা শিকড় সন্ধান করেছেন ঠিকই কিন্তু কখনোই কবিতা ও জীবনের মূল বা কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে ভাবেননি। এখানেই জহর সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। কেন-না, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি কাব্যগ্রন্থে তিনি প্রায় আচ্ছন্নের মতো বারবার মাটি ও শিকড় স্পর্শ করে নিজের অস্তিত্ব ও চৈতন্য গঠন করেছেন। আমরা বলতে পারি আবহমান কালের বাংলা কবিতার ধারায় জহর সেনমুজমদারের এখানেই বিশিষ্টতা। দেশ-মাটি ও শিকড়কে তিনি তাঁর কবিতায় এতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন যে, কবিচেতনা ও মনোবীজে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে দেশজ সংস্কৃতি, দেশজ কৃষ্টি ও দেশজ ভাবনাবিশ্বের কথা। তাঁর কবিতা পড়লেই বোঝা যায়। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন দেশ বাদ দিলে, মাটি বাদ দিলে, দেশজ ভাবনা বর্জন। করলে নিজের জন্ম ও জীবনের শিকড়টাই সম্পূর্ণ উৎপাটিত হয়ে যাবে। তাই শিকড়হীন সংস্কৃতিকে তিনি একেবারেই অস্বীকার করেছেন। এভাবেই তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে আমাদের ঐতিহ্য ও চেতনাপ্রবাহের শিকড়। এই সূত্রে তাঁর দু-একটি কবিতার কথা বলা দরকার। যেমন—'শ্রাবণশ্রমিক' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন :

"ভিখারীর পদপ্রান্তে পড়ে আছে লাল রক্তজবা; আমি আমার হৃৎপিণ্ড আর সামলাতে পারি না,ওগো সখা ওগো মাতাপিতা, শোনো এই খঞ্জনীগাঁয়ে একটি কুষ্ঠরোগী সারারাত তোমার একতারা বাজানোর পর এইমাত্র স্ত্রীগর্ভের ভিতরে

ঘুমিয়ে পড়েছে, পদ্মফুল আর ফুটবে না, পদ্মফুলআর ফুটবে না;
শ্মশানের পাদদেশে একটানা ঘুঘু ডাকিতেছে, শ্মশানের পাদদেশে
একটানা চাঁদ কাঁদিতেছে; একটি পয়ার এসে বাংলার ভূমিজলে পুনরায়
প্রবেশ করে

সখা তুমি বাংলার পয়ার বাঁচাও,
সখা তুমি আমাদের সকলের পয়ার বাঁচাও" (শ্মশানের পাদদেশে)

কিংবা 'হৃদয়প্রণীত সন্ধ্যাজল' কাব্যগ্রন্থের 'কালসখা' কবিতাটি :

'কালসখা, কালপ্যাঁচা, আমাদের বাড়ি নেই,
আমাদের বাড়ি নেই, নিঃস্ব রিক্ত ধু ধু দুর্বাদল
কেঁদে কেঁদে চক্ষুভার, ষড়রিপু ভাঙা, তবু যদি কিছু চাও
এই নাও, এই নাও, হৃদয়প্রণীত সন্ধ্যাজল
স্ফুটস্ফুট, অর্ধস্ফুট, হৃদয়প্রণীত সন্ধ্যাজল''

সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে কবিতা লিখবার পর বাংলা কবিতার জগতে আজ জহর সেনমজুমদার সবদিক থেকেই একজন বৃহৎ চৈতন্যের কবি। একদিকে তিনি যেমন বাংলা আধুনিক কবিতার ভাষায় নতুনত্ব ও অভিনবত্ব সঞ্চার করেছেন, তেমনি বাংলা কবিতার বিষয়ভাবনাকেও নানা বিচিত্র ও বিস্ময়কর পথে চালনা করেছেন। ১৯৬৯ সালে নকশাল আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে সমগ্র সত্তর দশক জুড়ে যে ভয়াবহ নৈরাজ্য, অস্থিরতা ও আর্তনাদ সময়, সমাজ ও বাস্তবকে সেই সময় অস্থির ও অশান্ত করে তুলেছিল— আটের দশকের শুরুতে কবিতা লিখতে এসে জহরের কবিতায় তার একটা বড়ো রকম প্রভাব পড়েছিল। প্রতিনিয়ত খুন-জখম, গুলি-বোমা-বারুদের ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বনগুলো যখন ভেঙে যেতে লাগল কিংবা নকশালবাড়ির কৃষক হত্যার প্রতিবাদে মুখর সমগ্র বাংলাদেশ যখন বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে উত্তাল হয়ে উঠেছিল— তখন এই সময়ে কবি জহর সেনমজুমদার বিপ্লবী কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও প্রতিবাদী কবি নবারুণ ভট্টাচার্যের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। বলা যেতে পারে তাঁদের সাহচর্যে, সংস্পর্শে থেকে জহরের মনেও হয়তো বা একটা বিপ্লবের আগুন ও প্রতিবাদের ছোঁয়া লেগেছিল। বিশেষ করে যখন আমরা তাঁর প্রতিবাদমূলক কবিতাগুলো পড়ি তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না— এইসব আন্দোলনের একটা বড়োরকম প্রভাব পড়েছে তাঁর মধ্যে। তবে একথা মনে রাখা দরকার তিনি যেহেতু মগ্ন, সমাহিত ও অন্তর্মুখী স্বভাবসম্পন্ন কবি, সেহেতু তাঁর কবিতা কখনোই সোচ্চার ও জোরালো জনগণতান্ত্রিক কবিতা হয়ে ওঠেনি। বরং তিনি আস্তে আস্তে নীরবে, নিভৃতে দেশ-কাল-সময় ও সমাজের যন্ত্রণাকে লিপিবদ্ধ করবার প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন। ফলে অশান্ত ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়কাল তাঁর কবিতার নানা পতি ও চিত্রকল্পে নানাভাবে প্রতিফলিত হলেও বাইরে থেকে চট করে তার নীরব প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ

অনেক সময়ই বোঝা যায় না। কিছুটা অরুণ মিত্রের ঢঙে তিনি একটানা কবিতা লিখে গেছেন— কোথাও সরাসরি চিৎকার করেননি। অর্থাৎ বলা যেতে পারে তাঁর কবিতা সময় সমাজ সংকটের প্রেক্ষিতে সরব চিৎকৃত কান্না নয়— নীরব কান্না বা অবচেতনার চাপা কান্না। ব্যক্তিজীবনে তিনি নীরবে নিভৃতে আড়ালে থাকতে যেমন স্বচ্ছন্দ বোধ করেন; তাঁর কবিতাও সেভাবে নীরবে নিভৃতে একটা নিজস্ব রক্তক্ষরণের জগৎ তৈরি করে নিয়েছে। আর এই জগতের কেন্দ্রে বিরাজ করছে দেশ কাল মাটি সংলগ্ন এই প্রবহমান শিকড়-সম্পৃক্ত ভূমি ও ভূমা।

তথ্যসূত্র :

১.জহর সেনমজুমদার.'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রথম প্রকাশ ঢাকা, কাগজ প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি,২০১৭,পৃ.-১৫৮

২.প্রাগুক্ত গ্রন্থ,পৃ.-৫১

৩.প্রাগুক্ত গ্রন্থ,পৃ.-৬৭

গ্রন্থপঞ্জি :

১.অশ্রুকুমার শিকদার: আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়, ১ম সংস্করণ, কলকাতা,করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারি,১৪০২ বঙ্গাব্দ।

২.জগদীশ ভট্টাচার্য: আমার কালের কয়েকজন কবি, ২য় সংস্করণ, পুনমুর্দণ, কলকাতা,ভারবি,আগষ্ট ২০০৪

৩.দীপ্তি ত্রিপাঠী: আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, ২য় সংস্করণ, কলকাতা দে'জ পাবলিশিং.জুন.১৯৮৪

৪.জহর সেনমজুমদার : কবিতার দ্বীপ কবিতার দীপ্তি, ১ম প্রকাশ, কলকাতা, সাহিত্যসঙ্গী, বইমেলা ২০০৮

৫.জহর সেনমজুমদার : শিকারী পরিবৃত জীবনানন্দ, ১ম প্রকাশ, কলকাতা, নান্দনিক, জানুয়ারি ২০০৮